ইউনিট 13

বাংলাদেশে বীমা ব্যবস্থা
Insurance Management in Bangladesh

ভূমিকা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। সেসাথে প্রসার ঘটেছে বীমা ব্যবসার। বীমা ব্যবসা প্রসার ঘটার আরো একটি কারণ হল এ দেশটির প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছর বন্যা, ঘুর্ণিঝর ইত্যাদি আঘাত হানে এবং ধংশ করে দেয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতিত্ব। এ ছাড়া দেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও বীমা ব্যবসা প্রসারে যথেষ্ঠ অবদান রেখেছে। আমাদের দেশের ৮৫% মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যে কারণে ইসলামী তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা। এ ইউনিটের মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশের বীমা ব্যবসার উপর একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন। তাহলে আসুন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিই।

পাঠ- ১ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার Dbœqb (Development of Insurance Business in Bangladesh)

উদ্দেশ¨

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার ইতিহাস বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বীমা ব্যবসার ক্ষমতায়ন (capacity building) -এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা নতুন নয়। এদেশে বীমা ব্যবসায়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মূলত: বৃটিশ আমল থেকেই বীমা ব্যবসার প্রচলন হয়। এ উপমহাদেশে Clauson Committee -এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৮ সালে ÒThe Indian Insurance Companies Act" নামে একটি বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়; যা ১৯৩৮ সালে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন হয়ে পুন:ঘোষিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর তদানিন্তন পাকিস্থানে উক্ত বীমা আইন কার্যকর করা হয়। তবে ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালে কিছু সংশোধন করা হয়। ভারতে ১৯৫৭ সালে বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ করা হলেও তৎকালীন পাকিস্ড়ানে তা ব্যক্তি মালিকানাধীনই থেকে যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বীমা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশ বলে দেশের সকল বীমা কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন দেশে ৭৫ টি বীমা কোম্পানী চালু ছিল। সবগুলো বীমা কোম্পানীকে ৫ টি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা: ১। বাংলাদেশ জাতীয় বীমা কর্পোরেশন, ২। কর্নফুলী বীমা কর্পোরেশন, ৩। তিস্তা বীমা কর্পোরেশন ৪। সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৫। রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন। জাতীয় বীমা কর্পোরেশন Underwriting Corporation হিসেবে কাজ করত না। এটা ছিল কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন, যার মূল দায়িত্ব ছিল অন্যান্য বীমা কর্পোরেশনগুলোর তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের কাজ; তিস্তা ও কর্নফুলীর দায়িত্ব ছিল সাধারণ বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সুরমা ও রূপসা বীমা কর্পোরেশন মূলত জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত।

পরে ১৯৭৩ সালের ১৪ মে 'বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ' ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত পাঁচটি বীমা কর্পোরেশনকে ২ টি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়। যথা: ১। জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

কিন্তু, রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন তাদের প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিকভাবে তেমন দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হয়। কথায় আছে 'সরকারকা মাল দরিয়ামে ঢাল'। ফলে পরবর্তীতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বীমা কোম্পানী যেমন- ১। বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ২। পিপল্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ৩। গ্রীন ডেল্টা

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ৪। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ কোম্পানী লি:, ৫। ইউনাটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ৬। পপুলার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ৭। প্রগতি জেনারেল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ৮। কর্নফুলী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি;, ৯। পূবালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ১০। সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ১১। ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ১২। রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:, ইত্যাদি।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা বীমা কোম্পানীগুলো হলো:
১। ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:
২। ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:
৩। সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:

বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু ইসলামী বীমা কোম্পানীও ব্যবসা পরিচলনা করে আসছে। যেমন, ফারইষ্ট ইসলামী বীমা কোম্পানী। ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী এই বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে বিদেশী বীমা কোম্পানী যেমন আমেরিকান লাইফ ইন্সরেন্স কোম্পানীও ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা সরকারী, বেসরকারী, বিদেশী এমনকি ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। তাই এদেশে বীমা ব্যবসা এক শক্তিশালী অবস্থান গড়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে যা অর্থনীতির চাকাকে আরও গতিশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বীমা ব্যবসায়ের বি-রাষ্ট্রীকরণ এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। বাংলাদেশে বীমা ব্যবস্থাকে প্রসার ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী প্রবর্তিত হয়। এবার আসুন এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করি।

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি (Bangladesh Insurance Academy)

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সব বীমা কোম্পানীগুলো রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। জাতীয়তাকরণ করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সেবা ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ বীমা কোম্পানীগুলোর মালিক ছিল পশ্চিমারা, যারা এদেশে বীমা ব্যবস্থাকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য খুব কমই নজর দেয়। যার ফলে বাংলাদেশের বীমা কোম্পানীগুলো পরিচালনার জন্য একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যার মধ্যে দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অধিকতর সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর প্রবর্তন করেন, যা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়েছিল।

১. বীমা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সংগঠন ও পেশাগত বিদ্যাদানের জন্য বীমার উপর ডিগ্র, ডিপ্লোমা, ও সার্টিফিকেট প্রদান।
২. দেশে বীমা ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।
৩. বীমা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য ইন-সার্ভিস শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪. বীমা বিষয়ের উপর প্রকাশনার জন্য উৎসাহ দান ও সুবিধা প্রদান করা।
৫. বীমার সাথে সম্পৃক্ত দেশীয় ও বিদেশীয় সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করা।
৬. বীমা পেশার উপর বিভিন্ন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, ও সার্টিফিকেট পাবার জন্য কোচিং সুবিধা প্রদান।
৭. যারা বীমা ব্যবসায় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখবে তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পুরুষ্কার ও পদক প্রদান করা।

পাঠ সংক্ষেপ: ১৩.১

এ উপমহাদেশে Clauson Committee -এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৮ সালে ÒThe Indian Insurance Companies Act" নামে একটি বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়; যা ১৯৩৮ সালে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন হয়ে পুন:ঘোষিত হয়। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশ বলে দেশের সকল বীমা কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন দেশে ৭৫ টি বীমা কোম্পানী চালু ছিল। সবগুলো বীমা কোম্পানীকে ৫ টি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে ১৯৭৩ সালের ১৪ মে 'বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ' ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত পাঁচটি বীমা কর্পোরেশনকে ২ টি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অধিকতর সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর প্রবর্তন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপমহাদেশে বীমা আইন প্রবর্তন করা হয়?
ক) ব্যাটেন কমিটি খ) ক্লসন কমিটি
গ) ডালটন কামটি ঘ) মিলটন কমিটি

২. The Indian Insurance Companies Act কোন সালে প্রবর্তন করা হয়?
ক) ১৯১৮ খ) ১৯২৮
গ) ১৯৩৮ ঘ) ১৯৪৮

৩. The Indian Insurance Companies Act কোন সালে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে পুনঃঘোষিত হয়?
ক) ১৯১৮ খ) ১৯২৮
গ) ১৯৩৮ ঘ) ১৯৪৮

৪. ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর বীমা ব্যবসায়ে কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক) রাষ্ট্রীয়করণ খ) বিরাষ্ট্রীয়করণ
গ) ইসলামীকরণ ঘ) কোনটি নয়

৫. ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে পাকিস্তান আমলের ৭২টি বীমা কোম্পানিকে কয়টি কর্পোরেশনে পরিণত করা হয়?
ক) ৪টি ঘ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৬. জাতীয় বীমা কর্পোরেশনের মূল কাজ কী ছিল?
ক) Underwriting খ) Maxinizing profit
গ) Controlling other corporation ঘ) কোনটি নয়

৭. ১৯৭৩ সালের বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে ৫টি কর্পোরেশনকে কয়টিতে রূপান্ড়রিত করা হয়?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪

৮. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর মূল কাজ কী?
ক) বীমা কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি করা খ) বীমা কোম্পানীর তদারকী করা
গ) বীমা কোম্পানির সক্ষমতা বিনির্মাণ করা ঘ) কোনটি নয়

পাঠ- ২ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বীমার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

☞ কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা ব্যবসাকে প্রভাবিত করে তা বলতে পারবেন;

☞ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বীমার ইতিবাচক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ও টর্নেডো ইত্যাদি বাংলাদেশের নিত্য সঙ্গি। ইতোমধ্যে দেশের বেশ কিছু অঞ্চল অতি প্রাকৃতিক ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল অঞ্চল অন্যতম। প্রায়ই এসব এলাকায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। দিন দিন এর পরিমাণ রেড়েই চলছে। যেমন- সাধারণত প্রতিবছর একবার উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় আঘাত হানে। এবার হয়েছে তিনবার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। এসব এলাকার মানুষজন মারা গেলে তাদের পরিবারের সদস্যদের পথে বসতে হয়। পঙ্গুত্ব বরণ করলে কিংবা সহায় সম্পদ হারালে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে যাপন করতে হয় এক মানবেতর জীবন। তাদের অনিশ্চিত এ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে বীমা। এবার আসুন জেনে নেই সেটি কীভাবে। জান-মালের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বীমা খাত হতে পারে জাতীয় বাজেটের অন্যতম প্রধান উৎস। বীমা খাতের সঞ্চিত অর্থ দেশের জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড় বায়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যা বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা হতে জাতিকে মুক্ত করতে পারে।

দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন রেড়েই চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও খরার সৃষ্টি হচ্ছে। আন্ড়র্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ হয়েছে আলোচনার এক অন্যতম এজেন্ডা। ইতোমধ্যে পরিবেশবিদ-বিজ্ঞানীরা ২০০৮ সালে মহাপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা ব্যক্ত করে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বিপর্যয়ের ডেঞ্জার লেবেলে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জলবায়ু বিশে- ষকদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বারবার সিডরের মতো ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি হিমালয় পর্বতের বরফ গলে বড় বড় বন্যারও সৃষ্টি করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগে কয়েক বছর পর পর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হলেও এখন প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এতে জান-মাল ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে দুর্গত মানুষের সংখ্যা হবে অনেক বেশি। কিন্তু জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের মত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এত গেল ভবিষ্যতের কথা। ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্যাগত বিষয়েও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক পরিসংখ্যান যথাসময়ে নিরূপন করা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ এমন নির্মম শিকার হচ্ছেন। প্রতিবারই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা কিংবা খরার মতো দুর্যোগ আসলে প্রতিকারের নানা কথা বলা হয়। কিন্তু দুর্যোগ চলে গেলে যেসব পরিকল্পনাও ধুয়ে মুছে চলে যায়। এ বিষয়ে বীমা কোম্পানিগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এবার আসুন আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির নানা তথ্যগত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

চলতি বছরেই (২০০৭-০৮) প্রলয়ংকরী বন্যা ও সিডরে আক্রান্ত হয়েছে দুই কোটিরও বেশি মানুষ। নিহত হয়েছেন প্রায় ৬ হাজার, আহত হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। ক্ষতি হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতি ও পশুপাখির বিলুপ্তি এবং উদ্ভিজ্জ প্রজাতির বিলুপ্তির ফলে জীবন-জীবিকার সংকট বাড়ছে। এ ক্ষতি মোকাবেলা করার সামর্থ নেই বাংলাদেশের। এ বিশাল ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন কাজের জন্য দাতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে মাত্র পাঁচ হাজার

কোটি টাকার। ক্ষয়-ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ আর দাতাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মধ্যে ব্যবধান বিশাল। সিডরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত লোক প্রায় এক কোটি। ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি জেলার মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১৬টি। আর বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। সরকার এ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে দাতাদের কাছে ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ সহায়তা চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিলেছে মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকার। উন্নয়ন সহযোগিদের কাছে গত বন্যার সময় ১৫০ মিলিয়ন ডলার চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাওয়া যায়নি। সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা পাওয়া গেছে মাত্র ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানেও প্রতিশ্রুত সম্পূর্ণ ত্রাণ সহায়তা পাওয়া যায়নি।

এদিকে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় কোটি মানুষের পুনর্বাসন করা জরুরী। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ সংকটই বড় সমস্যা। উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে যে সামান্য সহায়তা পাওয়া গেছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। মানবিক বিপর্যয়ের শিকার এ মানুষগুলোকে এখন বাঁচিয়ে রাখাটাই দায়। এখানে জরুরী হয়ে পড়েছে পুনর্বাসন কাজ এবং কর্মহীন মানুষগুলোকে আবারো তাদের নিজ নিজ পেশায় ফিরিয়ে নেওয়া। দুর্গতরা কাজ চায়। তারা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে কিংবা আগের পেশা শুরু করতে প্রয়োজনীয় পুঁজি চায়। এ অবস্থায় পর্যাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। বীমাবিদরা বলছেন, এসব ক্ষতিগ্রস্ড়দের যদি বীমা পলিসি থাকতো হাতলে বীমা দাবির টাকা দিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা অনেকাংশে সম্ভব হতো। এতে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা পরিহার কিংবা সরকারি অর্থের অনেক সাশ্রয় হতো নিঃসন্দেহে। পার্শ্বপর্তী দেশ ভারতে তাদের জাতীয় বাজেট এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান অর্থ যোগান দাতা হিসেবে বিরাট ভূমিকা রাখছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি)। যথাযথ উদ্যোগ নিলে যা আমাদের দেশেও সম্ভব।

পাঠ সংক্ষেপ: ১৩.২

দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন রেড়েই চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও খরার সৃষ্টি হচ্ছে। আন্ড়র্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ হয়েছে আলোচনার এক অন্যতম এজেন্ডা। ইতোমধ্যে পরিবেশবিদ-বিজ্ঞানীরা ২০০৮ সালে মহাপ্রাকৃতিক বিপর্যযের আশংকা ব্যক্ত করে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বিপর্যয়ের ডেঞ্জার লেবেলে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এতে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা পরিহার কিংবা সরকারি অর্থের অনেক সাশ্রয় হতো নিঃসন্দেহে। পার্শ্বপর্তী দেশ ভারতে তাদের জাতীয় বাজেট এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান অর্থ যোগান দাতা হিসেবে বিরাট ভূমিকা রাখছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি)। যথাযথ উদ্যোগ নিলে যা আমাদের দেশেও সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. কোনটি বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের অংশ নয়?

ক) বন্যা খ) জলোচ্ছ্বাস

গ) খার ঘ) ধূলিঝড়

২. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী?

ক) জলবায়ু পরিবর্তন খ) সরকারী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘ) খাদ্য ঘাটতি

৩. সিডরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত?

ক) ১০০ মিলিয়ন ডলার খ) ১২০ মিলিয়ন ডলার

গ) ২২০ মিলিয়ন ডলার ঘ) ৩২০ মিলিয়ন ডলার

৪. ঘুর্ণিঝড়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার কিসের উপর নির্ভর করে?

ক) ব্যাংক খ) বীমা

গ) কমিউনিটি ঘ) বিদেশী সাহায্য সংস্থা

পাঠ- ৩ বাংলাদেশে জীবন বীমা ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বাংলাদেশের জীবন বীমার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের জীবন বীমার সম্ভাবনা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের জীবন বীমার ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আইন, বিধি ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে জীবনবীমা প্রক্রিয়া চলমান। বীমায় নিয়োজিত কুশলীবৃন্দ তাদের মানসম্পন্ন পেশাদারিত্ব ও বীমা আচরণবিধি মেনে যথার্থভাবে জনসাধারণকে আর্থিক নিরপত্তা বিধান করবেন। যা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও হবে সহায়ক। এবার আসুন আমরা দেশে জীবনবীমার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করি।

জীবন বীমার সম্ভাবনা

জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ জীবন বীমা ব্যবসার বিশাল সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশে বীমা ভবিষ্যত নির্ভর করে কিভাবে বীমা কর্মকান্ড পরিচালনা করা হবে তার ওপর। সংক্ষিপ্তভাবে নিচে বিষয়গুলো বর্ণণা করা হলো-

ক) বীমা কুশীলবদের বীমা বিক্রয় কৌশল অবলম্বন,
খ) তথ্যপ্রবাহ প্রযুক্তির ব্যবহার,
গ) আইন ও বিধিসমূহের যথার্থ প্রয়োগ,
ঘ)বীমাবিদদের পেশাগত উন্নয়ন,
ঙ) সম্মিলিত পরিচালন সংস্কৃতি প্রয়োগ,
চ) বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনেতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মপকিল্পনা গ্রহণ।

চাহিদা এবং সরবরাহ

জীবন বীমার চাহিদা এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্যমান, ধর্মীয় বিশ্বাস, জনসংখ্যার আনুপাতিক বয়সের প্রকার, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষার স্তর ও সচেতনতার ঝুঁকি, কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের দ্বারা জীবন বীমায় আওতা তৈরি হয়।

অপরদিকে বীমাক্ষেত্রে সরকারি বাজারজাতকরণ নীতি, বীমা শিল্পের উদ্যোক্তাদের মূলধন ভিত্তি ও উদ্বৃত্ত, বীমা কর্মক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক ও গণযোগাযোগ মাধ্যম তৈরি, নীতি ও শৃঙ্খলার ধরন এবং তথ্যপ্রবাহের সহজলভ্যতা দ্বারা বীমার সরবরাহ অর্থাৎ বীমা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশে এ বিষয়গুলো পর্যাপ্ত রয়েছে; কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে জীবনবীমার পরিচালনায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃশ্যপট

সামাজিক ও অর্থনেতিক দৃশ্যপটে বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ৩১টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে স্থান নির্ণয় করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নবজাতক এবং শিশু মৃত্যুর হার, জন্মহার এবং স্বাভাবিক মৃত্যুহার অনেক কমেছে, যা জীবন বীমার অগ্রগতির সহায়ক। সঞ্চয় এবং লগ্নির হার বৃদ্ধি হাওয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশের মূলধন বাজার ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় এ ক্ষেত্রটি বিঘ্নপ্রাপ্ত জীবন বীমা কোম্পানিগুলোর শেয়ার বাজার তত উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এতদসত্ত্বেও জীবন বীমায় জনসাধারণের শেয়ার লেনদেনে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য রয়েছে। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ইতিমধ্যে আইপিওতে (Initial Pablic offering) না আসার জন্য ৯টি জীবন বীমা কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে।

পোশাক শিল্পে উত্তরণ ঘটায় ২০ লাখ মানুষ নিয়োজিত, যাদের অধিকাংশই নারী। জীবন বীমার জন্য এটিও একটি বিরাট ব্যবসা ক্ষেত্র। জীবন বীমার আর একটি ক্ষেত্র হলো বিদেশে বাংলাদেশীদের শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীরা বসবাস করেন যারা জাতীয় রাজস্ব আয়ের ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটান। প্রায় পঞ্চাশ লাখ বাংলাদেশী পরিবার প্রধান জীবন বীমার গ্রাহক শ্রেণীর যোগ্য। অথচ এ দু'টি খাতে জীবনবীমার তেমন কোন পরিলক্ষিত হয়নি। এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে বীমা ব্যবসার প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

আইন ও বিধি বিধানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন প্রয়োগ, জীবন বীমা কোম্পানিতে যোগ্য এবং যথার্থ ব্যক্তির সমাহার, দায়শোধে সক্ষমতার প্রান্তিক সীমা, লগ্নির নিয়মনীতি, বীমা এজেন্ট এবং এজেন্টদের নিয়োগকর্তাদের কমিশন কাঠামো

বিন্যাসকরণ, বীমা দাবি এবং এতদ্‌সম্পকিত সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বীমাশিল্প প্রসারে বীমাবাজার বিধি-বিধানের ব্যবস্থা দ্বারা বীমাশিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বীমা বিধির পাশাপাশি আয়কর আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন কেননা দেশে প্রচলিত কর নীতিমালা এ শিল্পে বিরূপ প্রভাব রেখেছে। আয়কর, কর্পোরেট ট্যাক্স, দানকর, উত্তরাধিকারীত্বের কর, সম্পদ কর, ভ্যাট ইত্যাদি প্রথম অবস্থাতে বীমার প্রোডাক্ট প্রস্তুতকালীন সময়ে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। বীমা কোম্পানি বিশেষত জীবন বীমা কোম্পানিগুলোতে বীমা পরিকল্পনাগুলো যুগোপযোগী, বীমা বিক্রয় কলাকৌশলের উন্নতি বিধানসহ প্রশাসনিক দক্ষতা, নৈতিকতা, সময়োপযোগী, বীমা বিক্রয় কলাকৌশলের উন্নতি বিধানসহ প্রশাসনিক দক্ষতা, নৈতিকতা, সময়োপযোগী সেবা এবং মানসম্মত হতে হবে।

সমস্যা ও সমাধান

বীমা ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে অপেশাধারী ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষ কর্মীর সংখ্যাধিক্য, সমাজে জীবন বীমার মূল্যায়ন নিম্নমুখী অবদান, ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী জীবন বীমার ধরন সম্পর্কে অজ্ঞানতা, বীমা দাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে মিডিয়াসমূহের নেতিবাচক মনোভাব, তাকাফুল বীমা ও একক বীমার তফাৎ বুঝতে অক্ষমতা, সমাজের ব্যক্তিত্ব ও ওলামাদের বীমা ক্ষেত্রে শরীয়ার কাঠামোগত বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ থাকায় জীবন বীমা নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত। এসব সমস্যা হতে উত্তরণে বীমা ক্ষেত্রের সকলকেই এগিয়ে এসে বাস্তব কর্মপন্থা নিরূপণ করতে হবে। যাতে করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা দেশের অর্থনীতিতে বীমাশিল্প যথার্থ অবদান রাখতে পারে। জীবন বীমা প্রসারে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি, জীবন বীমায় মাঠ ও বীমা পলিসিসমূহের একেক সময় একেক কোম্পানিতে স্থান বদল, ক্ষুদ্র বীমায় জটিলতা এসব অবস্থা হতে বেরিয়ে এসে সুবিন্যস্ত কর্মপ্রণালীর মধ্যদিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে জীবন বীমাশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রস্ড়াবিত ইন্স্যুরেন্স আইন ও তাকাফুল আইনকে যথার্থ জীবন বীমার উপযোগী করে প্রণীত করে যুগোপযোগী ও জনগণের আস্থাশীল করাতে হবে। বীমা বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক, পত্রিকা, ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে ব্যাপক হারে শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু সন্নিবিসিত প্রয়োজন।

বিশ্বায়ন ভীতি

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়ন আমাদের জীবনবীমাকে মারাত্নকভাবে প্রভাবিত করছে। তাহলে আসুন, এবারে বিশ্বায়ন বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। বাংলাদেশে মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধিতে বিশ্বায়নের যে ধারা বর্তমানে প্রবাহিত হচ্ছে তার সমর্থকরা এর সুফলের দিক নিয়ে উচ্চকণ্ঠ। এটা আপাতত দৃষ্টিতে ভাল বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে বিদেশি লগ্নিকারকরা লগ্নি করার পর যখন মুনাফা ও মুলধন এক সময় সরিয়ে নেবেন তখন দেশ দেউলিয়া হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বড় বড় ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পনি তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে একীভূত বা একটির মধ্যে অপরটি মিশে যাচ্ছে। এতে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষ উচ্চতর বেতনভুক্ত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করবেন। ফলে, দেশের কোম্পানিগুলোকে এক সময় ব্যবসার বাজার হতে পাততারি গুটাতে হবে, যা জাতীয় জীবনে আনবে মন্দাভাব।

বরং, টিকে থাকার জন্য আমাদের করণীয় হবে বীমা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ, বিক্রয় কর্মীদের বীমা পেশাদারিত্বে যোগ্যতরভাবে গড়ে তোলা, বীমাশিল্পের নিয়ামক প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিযুক্তি, দেশী ও বিদেশি বীমাবিদদের কৌশলগত সমন্বয় সাধনপূর্বক বীমাশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে দেশের আপামর মানুষের কল্যাণে তথা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে বীমাশিল্পের যথাযথ ব্যবহার দরকার।

সারসংক্ষেপ: ১৩.৩

জীবন বীমা মূলতঃ বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে এমন এক চুক্তি যা ক্রেতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিক্রেতাকে টাকার অংকে প্রদান করে দুঃসময়ে নিজের বা পরিবারের সদস্যদের জন্য আর্থিক নিশ্চয়তা বিধান করেন। বলাবাহুল্য, এমন একটা চুক্তির সফল বাস্ড়বায়নে বীমা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনয়ি খবরদারী যেমন দরকার, তেমনি বীমা শিল্পে নিয়োজিত কুশলীদেরকে অত্যন্ত দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের দ্বারা রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সৃষ্টিসহ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর তত্ত্বাবধানে দক্ষ বীমা কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। মোদ্দা কথা, এ শিলে।প বর্তমানের সকল অভ্যবস্থা দূর করে সুন্দরতর পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, যাতে বীমা শিল্পের চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষ এর সুফল ভোগ করতে পারেন। সুশৃঙ্খল বীমা বাজার আমাদের বিশেষবাবে কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. নিচের কোন শিল্পটি জবিনবীমা ক্ষেত্রে প্রসারে উপযোগী ক্ষেত্র?
ক) ব্যাংক খ) পাটশিল্প
গ) গার্মেন্টস ঘ) বস্ত্রশিল্প

২. জীবনবীমা শিল্পের প্রসারে সবচেয়ে বেশী বাধা জোনটি?
ক) বীমা আইন খ) দক্ষ জনশক্তি
গ) অর্থ বাজার ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য

৩. নিচের কোনটির মাধ্যমে জীবনবীমার প্রসার ঘটানো সম্ভব?
ক) বীমাকর্মীর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি খ) জীবনবীমার অফিসগুলোর উন্নয়ন
গ) জীবনবীমা বিষয়ের উপর ব্যাপক প্রচারণা ঘ) কোনটি নয়

পাঠ- ৪ বাংলাদেশে ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ইসলামী বীমা কেন আমাদের দেশের প্রচলিত হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইসলামী বীমার তাত্ত্বিক দিক বর্ণনা করতে পারবে;
- ইসলামী বীমা প্রসারে প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করতে পারবেন

বাংলাদেশের প্রায় ৮৫% মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এ কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে এর প্রভাব ফেলেছে। আার এরই প্রচলন হয়েছে ইসলামী বীমা প্রথা। এবার আসুন আমরা ইসলামী বীমা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। আল-কুরআনে আল-াহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমারা জেনে রেখো, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার দেবী, ভাগ্য জানার জন্য ব্যবহৃত শলাকাসমূহ শয়তানি কাজের অপবিত্রতা মাত্র। অতএব, তোমরা এর প্রত্যেকটি কাজই সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। তাহলেই আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে"। (সূরা-মাদিয়া: ৯০) আল-কুরআনে সুরা মায়িদায় জুয়াসহ উল্লেখিত কাজসমূহ সম্পূর্ণ পরিহার করার জন্য বলা হয়েছে। এর আলোকে জুয়া কিংবা জুয়ার উপাদানযুক্ত কাজও সম্পূর্ন পরিহারের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বীমা পরিহারের কথা বলতে থাকেন। আবার কেউ কেউ ইসলামী বীমা ও জুয়ার উপাদান মুক্ত নয় বলে তা পরিহারের কথা বলেন। যা সঠিক নয়। প্রচলিত বীমা ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত নয় বিধায় এতে জুয়ার উপাদান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলামী বীমা শরীয়াহ সম্মতভাবে পরিচালিত হওয়ায় এটি সম্পূর্ণ জুয়ার উপাদানমুক্ত।

ইসলামী বীমাকেও কেউ কেউ জুয়ার সাথে তুলনা করে প্রশ্ন তোলেন, বীমা আবার ইসলামী হয় কী করে? বীমা আর ইসলামী বীমা যে এক নয়- এ কথাটা তারা বুঝতে চেষ্টা করেন না। কুরআন সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান স্বল্পতার কারণেই সম্ভবত সংশি-ষ্টরা তা মনে করেন। আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী শরীয়াহ বিশারদগণ এ ইসলামী এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলামী বীমা জুয়া নয়। সম্পূর্ণ জুয়ার উপাদানমুক্ত। হালাল অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামী জীবন বীমা হচ্ছে বীমাকারী এবং বীমাগ্রহিতার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যা বীমা আইন ও ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। এ চুক্তি মোতাবেক বীমা গ্রহিতা প্রিমিয়াম প্রদান করেন এবং বীমাকারী তার প্রতিদানে বীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করেন। জীবন বীমার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুজণিত আর্থিক ঝুঁকি বহন করা। এছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অভ্যাস, সহজ কিস্তিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ, বিনিয়োগ, বোনাস আকারে লভ্যাংশ প্রদান ইত্যাদি সুবিধা বিদ্যমান। বীমা গ্রহণের মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা শুরুতেই সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

অপরদিকে জুয়া হচ্ছে বাজির খেলা। যে খেলায় হয় বিপুল প্রাপ্তির সুযোগ, না হয় নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা। জুয়া ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এতে একপক্ষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে আর অন্য পক্ষ বিপুল টাকার মালিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে হার অথবা জিত যে কোন একাটিকে ভাগ্য হিসেবে বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু ইসলামী বীমায় এ ধরনের কোন ঝুঁকির উপস্থিতি নেই। বরং আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলা করে থাকে। সহযোগিতা করে ক্ষতিগ্রস্থদের। অঙ্গিকার রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার। সর্বস্বান্ড় হবার কোন আশঙ্কাই নেই। যা বিশ্ব মানবতার জন্য এক কল্যাণমুখী অর্থ ব্যবস্থা। অপরদিকে জুয়াতে বাজি ধরতে হয়। যেমন কোন একটি খেলার 'জয়' 'পরাজয়' নিয়ে বাজি ধরা। এক ব্যক্তি বলল 'এ' দল জিতবে আরেক জন বলে 'বি' দল জিতবে। বাজি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে। দুজনে এক লাখ টাকা জমা করল। যে বাজিতে জিতবে সে পেয়ে যাবে এক লাখ টাকা। আর যে হেরে যাবে সে কিছুই পাবে না। এখানে যাকে নিয়ে বাজি হল সে তৃতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মাঝখানে দুজনের মধ্যে অনিশ্চয়তার লড়াই হয়ে গেল। ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। এখানে দুপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকারের আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে চুক্তি বলবৎ থাকে। চুক্তিটি হয় বীমাকারীর সাথে ব্যক্তির। চুক্তি মোতাবেক বীমা গ্রহীতা মেয়াদকালীন উভয় পক্ষের মধ্যে লাভ-ক্ষতির অংশিদারিত্বসহ বীমা গ্রহীতার আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। জুয়া খেলায় বাজি ধরতে হয়। কিন্তু ইসলামী বীমায় বাজি ধরার কোন ঘটনাই নেই। নেই হার জিত কিংবা কিছুই না পাবার শঙ্কা। জুয়া খেলায় জাবিই মুখ্য ঘটনা। বাজি ধরলে জুয়ার 'হার' 'জিত' এর ব্যাপারটি অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর বাজি না ধরলে জুয়া হয় না। জুয়া খেলতে গিয়ে যে লোকটি হেরে যায় সে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়এর যার বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে। জুয়া হারা এ লোকটিকে রক্ষা করার জন্য নিকট আত্নীয়, সমাজ বা রাষ্ট্র কারোর ওপরই দায়িত্ব বর্তায় না। আর জুয়াড়ী যদি জিতেও বিরাট অংকের টাকা পেয়ে যায় তাহলেও তার টাকার সাথে কারোর কোন সম্পর্ক হয় না। তার দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ইসলামে জুয়া হারাম। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা হালাল-হারাম পার্থক্যহীন সমাজে উদ্ভূত ও বিস্তার লাভ করেছে। সে বীমা ব্যবস্তায় কোন জুয়ার উপাদান থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইসলামী বীমা

ব্যবস্থায় জুয়ার কোন উপাদানে নেই। যেহেতু এখনে কোন বাজি ধরার বিষয় নেই। সেহেতু এর সাথে জুয়া খেলার 'হার' 'জিত' এর কোন মিল বা সাদৃশ্য কিছুই নেই। জুয়া খেলায় জাড়িত হলেই 'হার' অথবা 'জিত' যে কোন একটি স্বাদ নিতেই হয় যার কোন বিকল্প নেই। 'হার' এবং 'জিত' উভয়টাই জুয়াড়ীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। যেমন জিতলে সে আরো লোভী হেয় ওঠে। হয়ে ওঠে বেপরোয়া। আর বেশি পাওয়ার লোভে আরো বড় ধররেন বাজি ধরতে সে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। জুয়ার টাকা দিয়ে যে কোন অকল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে বেশি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ায় টাকা উড়ানোর প্রবণতা ঝেঁকে বসে তাকে। আর হেরে গেলেও সে পরিবার সমাজে বোঝা হয়ে পড়ে। সর্বস্বান্ত হয়ে সে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই কিংবা যে কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। এছাড়া জুয়া জুয়াড়ীকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। কারণ সে ফতুর হয়ে যেতে পারে অথবা বিপুল টাকা পেতে পারে। এতে সে তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। লটারীও এক প্রকার জুয়া। কারণ কিছু ব্যক্তি পুরস্কার পায়। আর অবশিষ্ট লোকদের সমুদয় টাকা গচ্ছা যায়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'মদ, জুয়া সম্পর্কে লোক তোমাকে প্রশ্ন করলে বল, এতদূভয়ে শক্তগুনাহ, এতে মানুষের উপকারও নিহিত, কিন্তু গুনাহ উপকার অপেক্ষা অধিক" সূরা বাকারা: ২১৯)।

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, :তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না"। (সুলা মায়িদা: ২)।

ইসলামী বীমায় জুয়া বা লটারীর মত কোন কিছু নেই। বীমাতে বীমা গ্রহণকারী সকলেই লাভসহ বীমাকৃত অংক ফেরত পায়। উপরন্তু যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা বা তাদের পরিবার আর্থিক সুবিধা পায়। বীমা গ্রহীতা মারা গেলে তাদের উত্তরাধিকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পায়। জমাকৃত প্রিমিয়াম বাজেয়াপ্ত হয় না। জীবদ্দশায় নিজে এবং মারা গেলে তার পরিবার এর সুফল ভোগ করে। জুয়া কিংবা লটারীতে যা কখনও সম্ভব নয়। বীমা করার পর মানুষের আর্থিক অনিশ্চয়তার ভাবনাটি মন থেকে দুরীভূত হয়ে যায়। লাভ করে এক অজানা প্রশান্তি। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থাকে। পুরো টাকা লাভসহ ভোগ করার পরিকল্পনা আটে। মৃত্যু পরবর্তীকালনি পরিবার-পরিজনকেও নিয়ে নেই আর্থিক ভাবনা। নিশ্চয়তা থাকছে, ক্ষতিগ্রস্থ হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "মোতাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষি ও অপর লোকের ওপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদের স্বচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভাল"। (সহীহ বুখারী)।

সারসংক্ষেপ: ১৩.৪

ইসলামী জীবন বীমা হচ্ছে বীমাকারী এবং বীমাগ্রহিতার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যা বীমা আইন ও ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। এ চুক্তি মোতাবেক বীমা গ্রহিতা প্রিমিয়াম প্রদান করেন এবং বীমাকারী তার প্রতিদানে বীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করেন। জীবন বীমার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুজণিত আর্থিক ঝুঁকি বহন করা। এছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের অভ্যাস, সহজ কিস্তিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ, বিনিয়োগ, বোনাস আকারে লভ্যাংশ প্রদান ইত্যাদি সুবিধা বিদ্যমান। বীমা গ্রহণের মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা শুরুতেই সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ইসলামে জুয়া হারাম। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা হালাল-হারাম পার্থক্যহীন সমাজে উদ্ভূত ও বিস্তার লাভ করেছে। সে বীমা ব্যবস্তায় কোন জুয়ার উপাদান থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় জুয়ার কোন উপাদানে নেই। যেহেতু এখনে কোন বাজি ধরার বিষয় নেই। সেহেতু এর সাথে জুয়া খেলার 'হার' 'জিত' এর কোন মিল বা সাদৃশ্য কিছুই নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. ইসলামী বীমাব্যবস্থা আমাদের দেশে সাফল্যের সাথে চলছে কারণ?
   ক) বাংলাদেশের মানুষ সৌদি আরবে চাকুরী করে
   খ) বাংলাদেশের মানুষ অধিকাংশ মুসলমান
   গ) বাংলাদেশের মানুয়ের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম
   ঘ) বাংলাদেশে ইসলামী আইন চালু আছে

২. ইসলামী বীমা কোন বিধান মতে প্রচলিত?
   ক) প্রচলিত আইন অনুযায়ী
   খ) শরীয়া আইন
   গ) তাকাফুল আইন
   ঘ) ইসলামী আইন

৩. ইসলামী বীমার মধ্যে কোন উপকরনটি নেই?

ক) আর্থিক লেনদেন খ) ঝুঁকি

গ) বীমা গ্রহীতা ঘ) জুয়া

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.১

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.২

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.৩

১. গ ২. ক ৩. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.৪

১. খ ২. গ